মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যঃ মধ্যযুগের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক উপস্থাপন (পঞ্চদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে পি.এইচ.ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণার সারসংক্ষেপ

গবেষক

শিল্পা মণ্ডল

এনরোলমেন্ট ডেটঃ ১৪/০৭/২০১৪

রেজিস্ট্রেশন নং- A00HI1200614

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মেরুনা মুর্মু

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২১

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যঃ
মধ্যযুগের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক উপস্থাপন (পঞ্চদশ- অষ্টাদশ শতাব্দী)

ভূমিকাঃ

গ্রামবাংলার অন্যান্য সকল লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে 'মনসা' ও 'চণ্ডী' সমাজে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। এঁরা মঙ্গলকাব্যের উল্লেখযোগ্য নায়িকা চরিত্র হিসেবেও সুপরিচিত। প্রধানত 'ভয়', 'ভক্তি' ও 'পরিত্রাণে'র পথ হিসেবেই উভয় দেবীর উত্থান ঘটে। দ্বাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে বঙ্গদেশে তুর্কি আক্রমণ শুরু হলে বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ইসলাম ধর্মের আগমন ও শাসককুলের ধর্মীয় ভিত্তি, এবং তাদের ধর্মান্তরিকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আগ্রাসী হওয়ার প্রবণতা, মূলতঃ চর্তুদশ শতকের মধ্যবর্তী কাল থেকে বাংলায় প্রচলিত হতে থাকে। বিশেষত, হিন্দু ধর্মের মধ্যে নিপীড়িত নিম্নবর্ণের মানুষেরা বর্ণবৈষম্য থেকে মুক্তিলাভের আশায় ধর্মান্তরিত হয়। অতএব বলা যায়, ইসলামীয় ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে বর্ণবৈষম্যতাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর এই জটিল পরিস্থিতিতেই হিন্দু ধর্মের ধারক ও বাহকেরা নিজ ধর্মের ঐতিহ্যকে বজায় রাখার তাগিদেই, ধর্মীয় বর্ম স্বরূপ 'মনসা' ও 'চণ্ডী'কে মূলস্রোতে আনার চেষ্টা করেন। এর ফলপ্রসূ, ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কালে বাংলায় মঙ্গলকাব্যের যুগের সূত্রপাত ঘটে।

পূর্ববর্তী গবেষণার প্রতি অবলোকনঃ

বর্তমান গবেষণার প্রধান উপজীব্য অনুযায়ী দুই লৌকিক দেবী 'মনসা' ও 'চণ্ডী'কে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া মঙ্গলকাব্যের প্রেক্ষিতে উভয়ের অবস্থান অনুসন্ধান করে, মধ্যযুগের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক জীবন এর মাধ্যমে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, সেই বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। তবে এর পূর্বে 'মঙ্গলকাব্যে'র প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা

প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যে দেবমাহাত্ম্যকীর্তনমূলক এবং বাস্তবসমাজচিত্রভিত্তিক কাহিনীকাব্যের যুগে 'মঙ্গলকাব্য' একটি অনবদ্য সৃষ্টি। আক্ষরিক অর্থে "মঙ্গলকাব্য" মূলত "মঙ্গল-সূচক" বা "কল্যাণ-সূচক" কাব্য হিসাবে উল্লেখিত। অর্থাৎ যে কাব্য পাঠে সর্ব অমঙ্গলের দূরীকরণ সম্ভব তাই "মঙ্গলকাব্য"। Edward C. Dimock, Jr. এর মতে পশ্চিমবাবংলার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য মঙ্গলকাব্যের প্রকৃত অর্থ হল 'গুণকীর্তনসূচক বা প্রশংসাসূচক কাব্য' অথবা "eulogistic poetry"।[1] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, মঙ্গলকাব্য প্রধানত বাংলা সাহিত্যের "প্রথম ও নিজস্ব পাঁচালী-কাব্য"।[2] আভিধানিক অর্থে "মঙ্গল" কথাটি "কল্যাণ" সূচকে বিবেচিত হলেও, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই শব্দটিকে "বিজয়" অর্থেও উল্লেখ করেছেন।[3] সেই সূত্রে, তুর্কি আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনকে অবশ্যই চিহ্নিত করা যেতে পারে। দ্বাদশ শতাব্দীর অন্তিম পর্যায়ে বাংলায় ইসলাম শাসককূলের আক্রমণ ও ইসলামের ধর্মান্তরিকরণ প্রক্রিয়া নির্ভর অগ্রসরী হওয়ার প্রবনতা, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজকে প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলে। একদিকে হিন্দু সমাজের বর্ণবৈষম্যবাদ, এবং অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের উদারতায় আকৃষ্ট হয়ে চতুর্দশ শতকের মধ্যকাল থেকেই, ধর্মান্তরের একটি জোয়ার বাংলায় লক্ষ্য করা যায়। এরফলে হিন্দু ধর্মের "রক্ষক"দের মধ্যেও ধর্মীয় ঐতিহ্যকে বজায় রাখার তাগিদ অনুভূত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে লৌকিক দেবদেবীর হিন্দু ধর্মের মূলস্রোতে উত্তরণের মধ্যে দিয়েই ঘটে "মঙ্গলকাব্য" এর উৎপত্তি।

"মঙ্গলকাব্যের" উত্থানের পিছনে তুর্কি আক্রমণ ও ইসলাম ধর্মান্তরিকরণ প্রক্রিয়ার তত্ত্ব সর্বত্রস্থিত। অর্থাৎ, কাব্যের উত্থানের পিছনে "ধর্মভিত্তিক" ধারণার উৎসকে অস্বীকার করা যায়না। মঙ্গলকাব্য প্রকৃতপক্ষে "ধর্মভিত্তিক" বা "সাম্প্রদায়িক" ধারণাপ্রসূত কিনা, বিদ্বৎকুলের কাছে তা

---

[1] Edward C. Dimock, Jr., "The Goddess of Snake in Medieval Bengali Literature", *History of Religions*, Vol. 1, No. 2 (Winter, 1962): 307-321.

[2] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মঙ্গলকাব্য', *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা*, (কলিকাতাঃ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, জুলাই ১৯৬৭), ৫০।

[3] *তদেব।*

সর্বদাই বিতর্কের বিষয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য কাব্যের নেপথ্যে সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাসকে প্রাধান্য দেননি।[4] তার মন্তব্য অনুযায়ী, "মঙ্গলকাব্য" মূলতঃ বাংলাদেশের লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয়ে সংগঠিত ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্য।[5] পালরাজাদের সময়কাল থেকে বঙ্গদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের সাথে স্থানীয় লৌকিক ধর্ম-সংস্কারের সংমিশ্রণ শুরু হয়। এরফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে লৌকিক ধর্মমতের উদ্ভব ঘটে।[6] সেনরাজাদের সময়কালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি সাধারণের মধ্যে ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করলে, বাংলায় দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের সংমিশ্রণ ঘটে।[7] মঙ্গলকাব্যগুলি মূলতঃ এর পরিচয় বহন করে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও মঙ্গলকাব্যকে "অসাম্প্রদায়িক" হিসাবে বিবেচনা করেন।[8] সুকুমার সেনও "মঙ্গলকাব্য"কে ধর্মবিশ্বাস বা সংস্কার বর্হিভূত "Secular"[9] কাব্য বলে মনে করেন। তবে, মঙ্গলকাব্যের উত্থানের পিছনে দ্বাদশ শতাব্দীর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনকে পর্যালোচনা করলে এর স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব হবে। দেবতার "মাহাত্ম্যকীর্তন" কাব্যের মূল বিষয় হওয়ায়, 'অহিন্দু' ধর্মমতের বিরুদ্ধাচারণই যে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে, একথা বলা বাহুল্য। তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় "মঙ্গলকাব্য"কে প্রতিযোগিতাপূর্ণ "সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যমূলক"[10] সাহিত্য হিসাবে অভিহিত করেন। শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যমূলক

---

[4] আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'পল্লীসমাজ ও পল্লীর সাহিত্য', *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, (কলিকাতাঃ এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০০০), ৯।

[5] *তদেব*, ১০।

[6] *তদেব।*

[7] *তদেব।*

[8] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মঙ্গলকাব্য', *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা*, (কলিকাতাঃ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, জুলাই ১৯৬৭), ৫১।

[9] সুকুমার সেন, 'বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও শাখাবিকাশ', *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম পর্ব, (কলিকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৩৪৭), ৬০।

[10] তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মঙ্গলকাব্য', *মধ্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্য*, (কলিকাতাঃ দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি লিমিটেড, আষাঢ় ১৩৫৮), ৪৯।

সাহিত্য নয়, তিনি এই কাব্যকে বর্ণবৈষম্যমূলক কাব্য হিসাবেও উল্লেখ করেছেন।[11] অনুরূপভাবে, হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্যও "মঙ্গলকাব্য"কে "হিন্দু ধর্মাশ্রিত" কাব্য হিসাবে মন্তব্য করেন।[12]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে "মঙ্গলকাব্য" এর রচনার পিছনে ধর্মভিত্তিক বিষয়সমূহের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানকে অনুধাবন করা যায়। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মনে করেন, "মঙ্গলকাব্য" প্রকৃতপক্ষে লৌকিক শাক্ত ধর্মের অন্তর্গত এক ধরনের "মঙ্গলসূচক" গান।[13] সুকুমার সেনও মঙ্গলকাব্যের কবিতার অংশগুলিকে "ব্রতগীতি" বা "ritual song"[14] হিসাবে উল্লেখ করেন। আবার হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের সরল ব্যাখ্যা অনুযায়ী, মঙ্গলকাব্যগুলি প্রকৃতপক্ষে "আখ্যায়িকা" কাব্য।[15] মঙ্গলকাব্যগুলি প্রধানত মৌখিক ঐতিহ্যের একটি অন্যতম অংশ। লৌকিক দেবদেবীর মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও, ব্রাহ্মণ্যবাদী ধ্যানধারণায় পরিপুষ্ট এটি এমন একটি "ধর্মভিত্তিক আবরণ", যার অন্তর্গত হতে পারে মূলতঃ সকল ধর্মের মানুষেরাই। উদাহরণ হিসাবে, মনসামঙ্গল "রাখাল" ও "ধীবর" সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করতে পারি। মনসার পূজা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চাঁদ বণিকের মাধ্যমে সম্পন্ন হলেও, দেবী কিন্তু নিম্নবর্ণের মানুষদেরকে সর্বপ্রথম তার কৃপাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করেন। অনুরূপভাবে, ব্যাধ কালকেতুও দেবী চণ্ডীর মহিমায় রাজা হয়ে বসেন। এরপর ধনপতি পুত্র শ্রীমন্তর পূজার্চনার দ্বারা তিনি ত্রিভুবনের দেবীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মনসামঙ্গলের "রাখাল" ও "ধীবর" সম্প্রদায় ছাড়াও

---

[11] *তদেব।*

[12] হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, 'মঙ্গলকাব্যের পরিচিতি', *বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ধারা,* (কলিকাতাঃ হাউস অব বুকস্, জানুয়ারী ১৯৫৭), ১।

[13] আশুতোষ ভট্টাচার্য (সম্পা. ও সং.), 'ভূমিকা', *বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা,* (কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৪)।

[14] সুকুমার সেন, 'বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও শাখাবিকাশ', *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,* প্রথম পর্ব, (কলিকাতাঃ মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৩৪৭), ৬১।

[15] হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, 'মঙ্গলকাব্যের পরিচিতি', *বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ধারা,* (কলিকাতাঃ হাউস অব বুকস্, জানুয়ারী ১৯৫৭), ১।

ইসলাম ধর্মপ্রচারক "হাসান" ও "হোসেন"ও মনসা পূজার পৃষ্ঠপোষকতা করেন।[16] এর মাধ্যমে অনুমান করা যায়, মনসামঙ্গল কাব্য সকল ধর্মের মানুষের আরাধনাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। অনুরূপভাবে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে অহিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বারা চণ্ডীপূজার দৃষ্টান্ত না থাকলেও, তিনি হিন্দু ধর্মের উভয় বর্ণের দ্বারা উপাসিতা তা প্রজ্বলিত।

পদ্ধতিগত দিক ও গবেষণার প্রশ্নঃ

বর্তমান গবেষণার পদ্ধতিগত দিক অনুযায়ী প্রাচীন পুঁথিগুলির সাহায্য অবলম্বন করে মধ্যযুগে বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক অবস্থানকে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও পরিসংখ্যান তত্ত্বের ভিত্তিতে লৌকিক দেবী 'মনসা' ও 'চণ্ডী'র আঞ্চলিক অবস্থানকে অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও কাব্যে বর্ণিত বিভিন্ন ভৌগলিক বিবরণগুলির লৌকিক ব্যাখ্যা মঙ্গলকাব্যের প্রাচীন পুঁথি ও সংকলিত কাব্যের মাধ্যমেই আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষণার মূল প্রশ্ন হল, মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলির মাধ্যমে মধ্যযুগের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক অবস্থানকে কিভাবে অনুধাবন করা সম্ভব?

অধ্যায় বিন্যাসঃ

প্রথম অধ্যায় বা মনসা ও চণ্ডীর আঞ্চলিক অবস্থান এবং মঙ্গলকাব্যের পরিপ্রেক্ষিতঃ গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে 'মঙ্গলকাব্যের নিরিখে চণ্ডী ও মনসার আঞ্চলিক অবস্থান' নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে 'মনসা' ও 'চণ্ডীর' নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনাকে বিশ্বব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা হয়েছে। 'মনসা'র বিশ্বব্যাপী রূপ অনুযায়ী তাকে সর্পকাল্টের অন্তর্গত করা যেতে পারে। এখন প্রশ্ন হল, সর্পপূজার অস্তিত্ব কিভাবে সর্বব্যাপী ধারণার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে ভারতের জাতীয়, এবং

---

[16] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, *মনসামঙ্গল,* অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.), (কলিকাতাঃ লেখাপড়া,১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), ১০।

জাতীয় ধারণার মধ্য দিয়ে বিবর্তন লাভ করে আঞ্চলিক দেবী মনসায় রূপায়িত হয়েছে? বাইবেলের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, সর্পের সহিত 'অমঙ্গলের' প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রলোভন, আকাঙ্খা প্রভৃতি বিষয়গুলি।[17] প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা থেকে শুরু করে বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই সর্প প্রতীকী চিহ্ন হিসেবে উপাসিত। Fergusson ধারণা অনুযায়ী সর্পের উত্থানের পিছনে 'সেমিটিক' বা 'আর্য' অস্তিত্ব অনুপস্থিত।[18] তার বক্তব্য থেকে অ্যাসিরীয়, মিশর ও ল্যাটিন কল্পকাহিনীতেও সর্প ঐতিহ্যের উদাহরণ পাওয়া যায়। ব্রিটিশ কেল্ট উপজাতি এবং গথিক স্ক্যাণ্ডিনাভিয়দের মধ্যে সর্পকাল্টের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।[19] প্রাচীন পারসিক পুরাণ, এমনকি অফ্রিকার অধিবাসীদের মধ্যেও সর্প ঈশ্বর রূপে বিরাজমান।[20] অতএব বলা যায়, বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই সর্প পূজিত হয় কখনো মঙ্গল, আবার কখনো অমঙ্গলের প্রতীক হিসেবে। অনুরূপভাবে, ভারতেও সর্পকাল্ট তার বৈশিষ্ট্যের পরিসর অতিক্রম করে আঞ্চলিক দেবী কাল্ট 'মনসা' এ রূপায়িত হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে 'রাজমার্তণ্ড' ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত দেবী ভাগবত ও নাগদেবীও, পরবর্তীকালে আঞ্চলিকতার ক্ষেত্রে দেবী 'মনসা' বা 'পদ্মা' রূপে পূজিত হতে থাকে। এর ফলপ্রসূ, বঙ্গীয় পুরাণে সর্পকাল্টের অন্তর্গত মনসা, ক্রমে শিবের ঔরসজাত হয়ে ঈশ্বরিক ক্ষমতা যুক্ত 'মানবী'তে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে লৌকিক ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সংমিশ্রণে দেবী 'মনসা' ক্রমে মঙ্গলকাব্যের অন্যতম নায়িকা চরিত্রে পরিণত হয়। আর সর্পের সাথে বেষ্টিত বিভিন্ন 'অমঙ্গলদায়ী' বিষয়গুলি ক্রমে লুপ্ত হয়ে 'মঙ্গলময়' ধারণার সাথে যুক্ত হয়।

অনুরূপভাবে, চণ্ডী কাল্টও ব্যাবিলন, মিশর, সুমের, এশিয়ামাইনর, গ্রীস প্রভৃতি দেশের 'ফার্টিলিটি কাল্ট' বা 'উৎপাদনশীল' প্রতীকের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে, ভারতীয় 'মাতৃমূর্তি'তে

---

[17] W. G. Moorehead, "Universiy of Serpent-Worship", *The Old Testament Student*, Vol. 4, No. 5 (Jan., 1885): 206.
[18] *তদেব*, ২০৬।
[19] C. Staniland Wake, "The Origin of Serpent-Worship", *The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, Vol. 2, (1873): 373.
[20] *তদেব*, ৩৭৩।

রূপায়িত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য এবং পুরাণ গ্রন্থগুলিতে 'শক্তি' কাল্টের সাথে 'মাতৃমূর্তি' বা 'মাতৃ' কাল্টের ধারণা সংযুক্ত হয়। সেখানে শক্তি মূলতঃ সৃষ্টি ও ধ্বংসের প্রতীক। শক্তি কাল্ট আবার 'অশ্বেতা' (কালী, দুর্গা, চণ্ডী, চামুণ্ডা) এবং 'শ্বেতা' (উমা, সতী, গৌরী, পার্বতী, অন্নপূর্ণা'), এই দুটি অংশে বিভক্ত। চণ্ডীর স্থান প্রধানত শক্তি কাল্টের অশ্বেতা অংশে। তবে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে, এই 'শক্তিস্বরূপা' দেবী ব্রাহ্মণ্য রাজনীতির প্রভাবে 'দেবীমাহাত্ম্যের' অন্তর্গত হয়ে ক্রমে 'মঙ্গলময়ী' দেবীতে পরিণত হয়।

'মনসা' ও 'চণ্ডী' উভয় দেবী যেহেতু আমার গবেষণার প্রধান দুই চরিত্র, তাই 'মঙ্গলকাব্যের' কবিরা কাব্যের মধ্যে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে কিভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন? এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে, উভয় দেবীর সূত্র শিবের সহিত। একজন তার জারজ কন্যা, অপরজন স্ত্রী। অতএব, মঙ্গলকাব্যের কবিরা সামাজিক উপাদান সংযুক্ত করে, উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছেন। তবে, মনসামঙ্গলের কবিদের মতো, চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে 'মনসা' ও 'চণ্ডী'র দ্বন্দ্ব অপেক্ষা একে অপরের প্রতি সহায়তামূলক ভাব সুস্পষ্ট। রামানন্দ যতির ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ধনপতি চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করে সিংহলে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে, 'পদ্মা' (মনসার অপর নাম) 'কমলে কামিনী' রূপে তাকে বিভ্রান্ত করে। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মতো মনসামঙ্গল কাব্যে এই দুই দেবীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রকাশ পাওয়া যায়না। এর পিছনে অবশ্যই মনসার শিবের জারজ সন্তান হওয়ার কারণ বর্তমান। তবে, আঞ্চলিকতার নিরিখে দুই দেবীর পরিচিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উভয় দেবীর লৌকিক সত্তা দেবীমাহাত্ম্যের অন্তর্গত হয়ে কখনো 'বিমলা', 'জগাতী', 'বড়মা', 'ব্রাহ্মনী', 'পদ্মা' ও 'মনসা' রূপে, আবার কখনো 'ঢেলাই চণ্ডী', 'দেবীচণ্ডী', 'জয়চণ্ডী', 'বুলবুলচণ্ডী', 'আটবাইচণ্ডী' প্রভৃতি চণ্ডীর বিভিন্ন রূপের সৃষ্টি হয়েছে।

<u>দ্বিতীয় অধ্যায় বা মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে শিবের অবস্থানঃ</u> গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে শিবের অবস্থান' নির্ণয় করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'মনসা' ও

'চণ্ডীর' আভ্যন্তরীণ সূত্রধর প্রধাণত শিব। মঙ্গলকাব্যে তার অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একাধারে মনসার পিতা ও চণ্ডীর স্বামী। তাকে এবং তার উপাসকদের কেন্দ্র করে মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে বিভিন্ন বিবাদের সূচনা। এমনকি মনসা ও চণ্ডীর বিবাদের প্রধান কারণ তিনি। অতএব, তাকে বাদ দিয়ে 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের' ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। তার পূর্বে ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংস্কৃত ও পৌরাণিক সাহিত্যগুলিতে শিবের স্বরূপ নির্ণয় করা প্রয়োজন। শিব মূলতঃ আপাতবিরোধী একটি চরিত্র। হিন্দু ধর্মে শিবের চরিত্রের সাথে বিভিন্ন বিষয়ের সংযুক্তি লক্ষ্য করা যায়। শিব কখনো 'যোগী, আবার কখনো সে 'কামরূপী'। অন্যদিকে সে 'পিতা' আবার 'পুত্র'ও। ভারতীয় হিন্দু সমাজে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী শিবের রূপের ভিন্নতাও বর্তমান। শিবপুরাণ অনুযায়ী 'শিবের' ধারণার ব্যাপকতাকে অনুভব করা যায়। শিবপুরাণে শিব একাধারে যেমন 'শক্তি', তেমনি 'মায়া', আবার 'জ্ঞানের' প্রতীক।[21] তিনি সত্য, রজ, তম এর উর্দ্ধে।[22] শিব প্রধানত এমন এক ধরনের 'ডিসকোর্স' বা 'ব্যাপ্তি', যার মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি সম্পৃক্ত। Wendy Doniger O'Flaherty তার 'Asceticism and Sexuality in the Mythology of Siva' নামক প্রবন্ধের প্রথম ভাগে 'শিবের' স্ববিরোধী রূপের বর্ণনা করেছেন। তার ধারণা অনুযায়ী, শিবের চরিত্রের সাথে দুটি বিষয়ের সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়। একদিকে শিবের 'সন্ন্যাস' রূপ, অন্যদিকে শিবের 'কামরূপ'।[23] তার মতে, শিবের রূপ এই দুই বিষয়ের সমন্বয়েই সংগঠিত। অর্থাৎ শিব একাধারে যেমন তপস্বী, তেমনি সে আবার সৃষ্টির বা প্রজননের প্রতীক।[24]

কিন্তু মঙ্গলকাব্যে তার অবস্থান কিরূপ? মধ্যযুগে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হওয়ায়, হিন্দু ধর্মেও শিবকে ভিত্তি করে সমাজ অনুযায়ী 'শিবকেন্দ্রিক' ধর্মীয় ধারণার বিবর্তন ঘটে।

---

[21] ARNOLD KUNST & J.L. SHASTRI (ed.), *ANCIENT INDIAN TRADITION AND MYTHOLOGY: THE SIVA-PURAN,* VOL-I, (DELHI: SUNDARLAL JAIN & MOTILAL BANARSIDAS, 1969), 173.

[22] *তদেব্,* ১৭৪।

[23] Wendy Doniger O'Flaherty, Asceticism and Sexuality in the Mythology of Siva (Part. I), *History of Religions,* Vol. 8, No. 4 (May. 1969): 300.

[24] *তদেব্,* ৩০১।

বিশেষত, মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে শিবকে কেন্দ্র করে 'ত্রিকোণ' সম্পর্কের ধারণা উৎপত্তি ঘটে। এই সম্পর্কের একদিকে যেমন শিবের পিতা রূপে অবস্থান, অন্যদিকে আবার পতি রূপে। আবার 'শিবের' ধারণার মধ্যে মধ্যযুগের সমাজজীবনের প্রতিফলনও পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যে 'শিবের' পৌরাণিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে লৌকিক আধার সংযুক্ত হওয়ার, তার দৈবীসত্তার সাথে মানবিক ধারণাও সংযুক্ত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের কবিরা শিবের মধ্যে লৌকিক সত্তার সমন্বয় সাধনের জন্য তাকে 'প্রতীক' বা 'মডেল' রূপে ব্যবহার করেছেন। আর এই প্রতীকের সাথে মানবিক সত্তার সংযুক্তি ঘটিয়ে 'শিবকে' পিতৃতান্ত্রিক 'পুরুষের' কাঠামোয় আবৃত করতে উদ্যত হয়েছে। এমনকি মঙ্গলকাব্যের যুগে শিবের লোকায়িত রূপ, তার পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক বাতাবরণকে খণ্ডন করে তাকে সাধারণ মানবের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছে।

পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে শিবের অবস্থান সুস্পষ্ট। শিব এখানে কখনো পিতা, কখনো স্বামী, আবার আরাধ্য দেবতা। আবার অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তিনি দারিদ্রতা আভরণে আবৃত। দারিদ্রতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার জন্য শিবের রূপ 'দরিদ্র কৃষক'। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, উত্তরবঙ্গের সাধারণ কৃষক সমাজ শিবের ধারণার মাধ্যমেই পরিকল্পিত হয়েছিল।[25] কিন্তু কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে তার কৃষিকার্যে অনিহা, এবং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করায় তার সংসারের দারিদ্রতা মূলতঃ তৎকালীন সমাজে 'দরিদ্র কৃষকের' সাংসারিক চিত্রের প্রতিফলন ঘটায়। এখন প্রশ্নও হল, অর্থনৈতিক, ধর্ম, শ্রেণী ও লিঙ্গভিত্তিক ধারণার নিরিখে পৌরাণিক শিব কিভাবে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও শিবায়নের বর্ণিত হন? দ্বিজ বংশীদাসের কাব্য অনুযায়ী শিব প্রধানত সকল বর্ণের আরাধ্য দেবতা।[26] পঞ্চদশ

---

[25] আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য', *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, (কলিকাতাঃ এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০০০), ১৪৩।

[26] দ্বিজ বংশীদাস, *পদ্মাপুরাণ*, শ্রী রামনাথ চক্রবর্তী ও শ্রী দ্বারকানাথ চক্রবর্তী (সম্পা.), (কলিকাতাঃ ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, বৈশাখ ১৩১৮)।

শতাব্দীতে রচিত নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণ' থেকে শিবের চরিত্রকে শ্রেণীভিত্তিক ও লিঙ্গভিত্তিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা সম্ভব। কাব্য অনুযায়ী শিব ভিখারী। ভিক্ষা করে তিনি পরিবার পালন করেন। শিবের 'ভিক্ষুক' রূপ পৌরাণিক 'তপস্বী' বা 'যোগী' রূপের সমতুল্য। ধর্মীয় গ্রন্থগুলিতে ভিক্ষা করা কোনোরূপ খ্যাতিহীনতার কার্য নয়। আর পুরাণে শিবের এই রূপ মানবিক সত্তার উর্দ্ধে। শিবের গৃহে দারিদ্র্য সর্বক্ষণ। দারিদ্র্যের কারণে তার স্ত্রী ও সন্তানেরা উপবাসী। প্রধানতঃ তৎকালীন সমাজে দরিদ্র পরিবারের দুঃখকে উপস্থাপিত করার জন্য, শিবের ভিক্ষুক রূপের উপস্থাপন। এখানে কবি বংশীদাস শিবের ভিক্ষুক রূপকে আধ্যাত্মিকতার মোড়কে আবদ্ধ করে। তবে, এখানে শিবের 'ধূমপান' এর বিষয়টি উল্লেখিত। কবি 'ধূমপানের' বিষয়টি এমনভাবে 'শিবের' সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন, যার মাধ্যমে শিবকে নেশাগ্রস্থ পুরুষের সাথে তুলনা করা যায়। মুকুন্দরাম বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিবের ভিক্ষুক রূপ ঈশ্বর তুল্য হলেও, শিব স্বয়ং গিরিসুতাকে দরিদ্রের জীবনের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রায় সবগুলি সংস্করণে 'শিবের' দারিদ্র্যের বিষয়ে বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও শিবের 'বহুবিবাহ'। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ মূলতঃ তৎকালীন সময়ের কুলীনপ্রথার সমর্থন জ্ঞাপনে শিবকে একাধিক বিবাহ দেন। 'শিব' এখানে প্রতীক স্বরূপ। তিনি প্রধানতঃ লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির শিকার। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের বহুবিবাহকে স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যেই মঙ্গলকাব্যের কবিরা তাকে ব্যবহার করেন। শিবপুরাণে শিব পত্নীব্রতা, কারণ সতীর মৃত্যুর পর সে ব্রহ্মচর্য পালন করে। এমনকি কেবলমাত্র জাগতিক প্রয়োজনেই তার পুনরায় বিবাহ করা। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে শিবের মানবিক সত্তার সাথে তৎকালীন পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সংযোগ সাধন, প্রধানত পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই। এর মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

মনসামঙ্গলে বিভিন্ন সামাজিক, শ্রেণীভিত্তিক ও লিঙ্গভিত্তিক বিষয়ের সাথে শিবকে সংযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলে শিবের সোজাসাপ্টা তপস্বী রূপ বর্তমান। শিবের গৃহী জীবন কখনো তার

তপস্বী রূপের খণ্ডণ করতে পারেননি। কিন্তু মনসামঙ্গল কাব্যের কবিরা 'শিব'কে তৎকালীন সমাজের পুরুষের সমতুল্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাই শিবের প্রতিচ্ছবির মধ্যেও শ্রেণীভিত্তিক ও লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'শিব' এখানে নিজেই সামাজিক রাজনীতির শিকার। শিবকে ' দরিদ্র', তার ' বহুবিবাহে' অবস্থান, তাকে ' ব্যাভিচারী' এবং ' দায়িত্বহীন পিতা' এর প্রতিমূর্তিতে নির্মাণ করার পিছনে, সমাজের নিজস্ব স্বার্থ জড়িত। প্রধানত শিবকে বৃহৎ প্রেক্ষিতে বিচার করে বিভিন্ন সামাজিক, শ্রেণীভিত্তিক ও লিঙ্গভিত্তিক বিষয়গুলিকে তার অন্তর্গত করা হয়েছে। এর একমাত্র কারণ সেই সব বিষয়ে সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়া।

<u>তৃতীয় অধ্যায় বা মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাংলার বাণিজ্যপথের ঐতিহাসিক পর্যালোচনাঃ</u>

বাংলায় বাণিজ্যকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য উপাদান হল মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যগুলি। মঙ্গলকাব্যগুলি প্রাথমিকভাবে দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হলে, পঞ্চদশ থেক অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করলে, মাহাত্ম্য প্রচার ব্যতিরেকে এর অন্যান্য বিষয়গুলিকে আলোকপাত করা সম্ভব হবে। মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্য একদিকে যেমন 'মনসা' ও ' চণ্ডী'র বিভিন্ন রূপের নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনায় সহযোগিতা করে, অপরদিকে তেমনি শ্রেণীভিত্তিক এবং লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক বিষয়গুলিকে উল্লেখ করে। অনুরূপভাবে কাব্যের বিভিন্ন অংশ থেকে মধ্যযুগে নদীকেন্দ্রিক বাণিজ্যিক অবস্থানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কাব্যের মুখ্য চরিত্র যেমন, চন্দ্রধর, ধনপতি এবং শ্রীমন্ত সওদাগররা সুদূর সিংহলে সপ্তডিঙা ও মধুকর ভাসিয়ে কিভাবে বাণিজ্য করতেন, কাব্যগুলির মাধ্যমে তার কল্পনাশ্রিত চিত্রকে অনুধাবন করা যায়। এছাড়া তাদের বাণিজ্যিক কৌশল এবং বাণিজ্যক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা তাও কাব্যে বর্ণিত। বাংলার তথা বাঙালির বাণিজ্যের প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী গবেষণাগুলিতে কেবলমাত্র সুপ্রাচীনকাল থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সামুদ্রিক বাণিজ্যের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও বাংলার বাণিজ্য আদৌ বাঙালির বাণিজ্য

কিনা তাও পূর্ববর্তী গবেষণাগুলিতে উল্লেখিত। অনিরুদ্ধ রায় এই প্রসঙ্গে মনে করেন যে, 'বাংলার সওদাগর' এবং 'বাংলার বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি' সমুদ্রবাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলেও, বাংলার বণিকরা প্রকৃতপক্ষে বাঙালি বণিক কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।[27] বারবোসার বৃত্তান্ত অনুযায়ী বাংলার বণিকদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন মুসলমান।[28] এরা ছিলেন মূলতঃ আরব, পারস্য এবং আবিসিনিয়া অঞ্চলের লোক।[29] অতএব, বাংলার বণিকের বাস্তবতা প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী গবেষণাগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে। তবে, বর্তমান অধ্যায়ে বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ছাড়াও, স্থান ও সময়ের ভিত্তিতে মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণগুলিতে নদী বাণিজ্যপথগুলিকে কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার তুলনামূলক আলোচনা করা হবে। এছাড়াও মঙ্গলকাব্যের সামুদ্রিক বাণিজ্যপথগুলির মধ্যে বিভিন্ন 'দহ' বা 'হ্রদের' প্রকৃত অবস্থানকে উল্লেখ করা হয়েছে। 'দহ'গুলির অবস্থান আবার বাণিজ্যপথের ক্ষেত্রে লাভজনক না অলাভজনক তাও উক্ত অধ্যায়ে উল্লেখিত। উদাহরণ হিসাবে 'কড়িদহ', 'শঙ্খদহের' উল্লেখ করা যেতে পারে।

<u>চতুর্থ অধ্যায় বা মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধর্মভিত্তিক ও শ্রেণিগত দ্বন্দ্বের বিবরণঃ</u>

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভিত্তিক ও শ্রেণীভিত্তিক দ্বন্দ্বের অবতারণা করা আমার গবেষণার অপর একটি উদ্দেশ্য। Richard Eaton এর বক্তব্য অনুযায়ী, তুর্কি আক্রমণের সময়কালে 'ইসলামীয়করণ' প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে, সমাজে ধর্মান্তকরণ ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয়েছিল। এই 'ইসলামীয়করণ' প্রক্রিয়াকে তিনি চারটি তত্ত্বে বিভক্ত করেছিলেন, যথাঃ ইমিগ্রেশন থিওরি বা অভিপ্রয়ান তত্ত্ব, সোর্ড থিসিস বা যুদ্ধজয়ের তত্ত্ব,

---

[27] সুশীল চৌধুরী, 'মধ্যযুগে বাংলার সমুদ্রবাণিজ্যঃ মঙ্গলকাব্যে,' *সমুদ্রবাণিজ্যের প্রেক্ষিতে স্থলবাণিজ্যঃ ভারত মহাসাগর অঞ্চল ১৫০০-১৮০০,* (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০১৭), ২২।

[28] Duarte Barbosa, *The book of Durate Barbosa*, Mansel Longworth Dames (trs.), Vol. 2, (London : The Hakluyt Society, 1921), 135-141.

[29] *তদেব।*

রিলিজিয়াস পেট্রোনেজ থিওরি বা ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতার তত্ত্ব এবং রিলিজিয়ান অব্ সোশ্যাল লিবারেশন থিসিস বা সামাজিক ও ধর্মীয় উদারীকরণ তত্ত্ব।[30] এখন প্রশ্ন হল, মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিরা 'ইসলামীয়করণ' প্রক্রিয়াকে তাদের কাব্যে কিরূপে ব্যাখ্যা করেছেন? পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গলের প্রায় প্রতিটি সংস্করণে 'ইসলামীয়করণ' প্রক্রিয়ার প্রভাব প্রতিফলিত হয়। তবে, Richard Eaton যেভাবে 'ইসলামীয়করণ' প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেন, মনসামঙ্গলের কবিরা কিন্তু এই প্রক্রিয়াকে সেরূপে ব্যাখ্যা করেননি। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইসলামীয়করণ প্রক্রিয়াকে বলপূর্বক ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসা-মঙ্গল' এ 'হাসন হুসেনের' সাথে মনসার যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা থেকে হিন্দু ও মুসলিমের দ্বন্দ্বের বিবরণ। তাদের কথোপকথনের কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় 'হাসনের' মনসাকে 'হিন্দুর ভূত' হিসেবে বর্ণনা করে। আবার মনসাও হাসনকে মসজিদ ভেঙে মন্দির নির্মানের কথা বলেন।[31] অর্থাৎ সম্প্রদায়ভিত্তিক দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। এছাড়াও মনসা ও হাসনের একে অপরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া মূলতঃ হিন্দু ও মুসলিমের ধর্মভিত্তিক দ্বন্দ্বকেই ব্যাখ্যা করে। মনসা কর্তৃক হাসনের সম্পূর্ণ গ্রাম উজার করে দেওয়া, বিশেষত হাসনের ইসলাম ধর্ম প্রচারকদের প্রাণে মেরে ফেলা, প্রধানত ইসলাম ধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর ক্ষোভকে প্রতিফলিত করে। এর ফলপ্রসূ, তাদের ভয় ও ক্ষোভের প্রতিফলন হিসেবে বিভিন্ন মনসামঙ্গলের সংস্করণে 'হাসন-হুসেন' পর্বের উত্থান ঘটে। এখন প্রশ্ন হল, 'হাসন-হুসেন' নামের তাৎপর্যতা কি? ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে মঙ্গলকাব্য রচনার যুগে হুসেন শাহ্ এর কথা জানা যায়। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের কবিরা মনসা কর্তৃক হাসন-হুসেনকে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে যে কাহিনীর উত্থাপন ঘটায়, তা কারবালায় আল্লার দুই নবী 'হাসন-হুসেনের' ঘটনার সমতুল্য। অর্থাৎ তৎকালীন কবিরা 'হাসন-হুসেনের' হাত থেকে মনসার

---

[30] Richard M. Eaton, 'Mass Conversion to Islam: Theories and Protagonists', *The Rise of Islam and the Bengal Frontier,* 1204-1760, (New Delhi: Oxford University Press, 1994), 112-118.

[31] কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, *মনসামঙ্গল* অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পা.),(কলিকাতা, লেখাপড়া, নাগপঞ্চমী, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ)।

পূজা পাওয়াকে, মূলতঃ অহিন্দু ধর্মকে হিন্দু ধর্মের পদানত করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। চণ্ডীমঙ্গলে যদিও ধর্মভিত্তিক দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। কিন্তু রামানন্দ যতি ও মুকুন্দরামের রচনায়, কালকেতু গুজরাট নগর স্থাপন করলে সেখানে অন্যান্য সকল শ্রেণীর সঙ্গে, 'যবন' বা ইসলাম ধর্মের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে অনুমান করা যেতে পারে যে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলি ইসলামীয় আক্রমণের কিছুকাল পরে রচিত হওয়ায় সেখানে সহাবস্থানের ভাব সুস্পষ্ট।

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতির অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিকভাবে আর্থিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান গড়ে ওঠে। এরপর বর্ণভিত্তিক রাজনীতি ক্রমে শ্রেণীভিত্তিক, এবং শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতি ক্রমে জাতিভিত্তিক রাজনীতির সৃষ্টি করে। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের কবিরা ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল শ্রেণীর মন্দ দিকের বিবেচনা করেছেন। বিশেষত, নিম্নবর্ণের মানুষদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাহিনীর প্রকাশ ঘটিয়ে, তাদেরকে 'অপরাধী' বা 'দুর্জন' হিসেবে বর্ণনা করতে উদ্যত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, ধীবরজাতির জালু-মালু কর্তৃক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীরূপী মনসাকে মাঝ নদীতে ফেলে দেওয়ার কাহিনী বর্ণিত। চণ্ডীমঙ্গলে আবার কালকেতুর গুজরাট নগরীতে বৃত্তি অনুযায়ী বিভিন্ন জাতের মানুষদের ক্রমান্বয়ক্রমের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এমনকি ধনপতির গৃহে দুর্বলা দাসীর শঠতাকে ব্যাখ্যা করে নিম্নবিত্ত অবলম্বনকারীদের 'শঠ' বা ' দুর্জন' হিসেবে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। অতএব বলা যায়, কাব্যে নিম্নবিত্ত অবলম্বনকারী নিম্নশ্রেণীর মানুষদের অপরাধী হিসেবে প্রমাণ করার প্রবণতা প্রধানত ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ।

<u>পঞ্চম অধ্যায় বা মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লিঙ্গভিত্তিক অবস্থানঃ</u> এই অধ্যায়ে 'মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে লিঙ্গভিত্তিক অবস্থান'কে আলোচনা করতে উদ্যত হয়েছি। মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা তথা যেকোন সময়কালীন সমাজে, ' লিঙ্গভিত্তিক অবস্থান'কে নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা সর্বদা 'নারীর সামাজিক অবদমন' নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী হয়ে পড়ি। মঙ্গলকাব্যের নারীদের পরিপ্রেক্ষিতে

লেখা পূর্বের ও সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত গবেষণাগুলিতেও এই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। জয়া সেনগুপ্তের রচনাতে যেমন বহুবিবাহভিত্তিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর দুরাবস্থার এবং স্বল্প ক্ষেত্রে নারীর সচেতনতার চিত্র পাওয়া যায়, তেমনি মনসামঙ্গলের নিরিখে বিশ্লেষিত গবেষণাগুলিতেও নারীর সামাজিক অবহেলার রূপ পর্যালোচিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী সামাজিকভাবে অবদমিত, তাতে কোন দ্বিমত নেই। এমনকি বর্তমান সমাজেও নারীর সামান্য ক্ষমতায়ণ সম্ভব হলেও, তারা কিন্তু সামাজিকভাবে অবহেলিত। তবে, বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী 'নারীর অবস্থান' নির্ণয়ের সাথে 'লিঙ্গভিত্তিক' বিভিন্ন বিষয়গুলিও আলোচনা করা হবে। কারণ লিঙ্গভিত্তিক আলোচনাকে 'নারীভিত্তিক' বিষয়ে মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে 'নারী-পুরুষ' এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এছাড়া 'যৌনতাকে' আলোচনার মূল অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কিভাবে তার অন্তর্জালের আবরণে 'নারী' ও 'পুরুষ' উভয়কে বেষ্ঠন করে 'লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধানকে' কায়েম করেছে, তা আলোচনা করা প্রয়োজনীয়। প্রথমেই বলা যাক, সন্তান প্রজননের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধান কিভাবে কায়েম হয়েছে? সমাজে পুত্রসন্তান একান্তভাবে কাম্য। মঙ্গলকাব্যগুলিতে পুত্র ও কন্যা সন্তানের নিরিখে 'লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধানের' ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পুত্রসন্তান কূল বা বংশ রক্ষা করে। আবার পরিবারকে বিভিন্ন সামাজিক বিপদ থেকেও রক্ষা করে। জরৎকারু মুনি বিবাহের পর মনসাকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হলে, মনসা তার কাছ থেকে 'পুত্রসন্তানের' কামনা করে। আবার শিবের ঔরসে চণ্ডীর পুত্রসন্তান পাওয়ায় ইচ্ছা মূলতঃ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধানকে চিহ্নিত করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর একান্ত ভরসা তার স্বামী ও পুত্র। আর কন্যাসন্তানের জন্ম হলে তাকে রক্ষা করবে কে? বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসা-বিজয়' এ জরৎকারু মনসাকে অষ্ট পুত্রের বরপ্রদান করে। কন্যাসন্তানের জন্য কোনরকম কামনা মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সংস্করণগুলোতে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সন্তানের জন্মকে কেন্দ্র করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পক্ষপাত, উল্লেখিত উদাহরণের মাধ্যমে অনুমান করা যায়। বিবাহের ক্ষেত্রেও পিতৃতান্ত্রিক

রাজনীতি মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণ থেকে পাওয়া যায়। বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর বয়স সীমা সাত থেকে এগারো বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।[32] কিন্তু পাত্রের কোন বয়স সীমার উল্লেখ মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায়না। রজঃস্বলার পর রমণীর শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। এর সাথে তার বুদ্ধিও পরিপক্ক হয়। সে তার শরীর সম্বন্ধে অবগত হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর শরীর সম্বন্ধীয় চেতনা জাগ্রত হওয়ার পূর্বেই তাকে বৈবাহিক কাঠামোয় বন্দী করতে আগ্রহী। বিবাহের ক্ষেত্রে অপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পণপ্রথা। কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা কন্যাকে সুখী করার জন্য পাত্রপক্ষকে যৌতুক প্রদান করে। যৌতুকের পরিমাণ ঠিক কতোটা হয়ে পারে, তার ব্যাখ্যা মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়। পাত্রপক্ষের যৌতুক পাওয়ার আকাঙ্খাও মঙ্গলকাব্যগুলিতে বর্ণিত।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের একাধিক বিবাহ তার পুরুষত্বকে প্রমাণ করে। একাধিক বিবাহের পর 'সতীনদের' নিজেদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, তার আভাষও মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়। 'সতীন কাঁটা' এর বিষয়টি নারীদের ক্ষোভ ও ঈর্ষার প্রতিফলন ঘটায়। ঈর্ষা ও ক্ষোভের কারণে সে নানারকম ষড়যন্ত্র করে। এমনকি, সতীনকে কলঙ্কিত করার জন্য নানারকম পরিকল্পনা করে। উদাহরণ হিসেবে, খুল্লনাকে কলঙ্কিত করার জন্য লহনার ষড়যন্ত্রের কথা অনুমান করা যায়। সতীনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ব্রত পালনের কথাও মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত। তবে, ' সতীন বিদ্বেষী' ধারণা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি। পুরুষের বহু বিবাহের প্রতিফলন।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে 'সতী' নারীর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 'সতী' নারী, যে পতির অনুগত, পরিবারের অনুগত। পতির অনুমতি ছাড়া সে তার যৌনতাকে উপলব্ধি করতে অক্ষম। পুরুষ যৌন আকাঙ্খা নিবৃত্তিকরণের জন্য একাধিক বিবাহ করে। প্রয়োজনে গণিকালয়ে যাতাযায় করে। কিন্তু নারীর কামনাকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ প্রশয় দেয়না। বেহুলা, ফুল্লরা, খুল্লনার মতো চরিত্রগুলো পিতৃতন্ত্রের

---

[32] কবিকঙ্কণ মুকুন্দ- বিরচিত, *চণ্ডীমঙ্গল,* সুকুমার সেন (সম্পা.), (নয়াদিল্লীঃ সাহিত্য অকাদেমি, বৈশাখ ১৩৮২), ১১৩।

সৃষ্টি। এরা স্বামীর সাথে সহমরণে যেতে পারে। কিন্তু স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের কথা ভাবতেও পারেনা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ বেহুলা, ফুল্লরা ও খুল্লনার মতো চরিত্র সৃষ্টি করে 'সতী' নারীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন। সমস্ত নারীদের অবশ্যই বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্তর্গত হতে হবে। তারা নাহলে ' সতী' তক্‌মা থেকে বিচ্যুত হবে। এছাড়াও বর্তমান অধ্যায়ে নারীর ' সৌন্দর্য'কে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এমনকি কবিদের কল্পনা বা উভয় দেবী কর্তৃক প্রদত্ত 'স্বপ্নাদেশে'ও নারীর দৈহিক বিবরণেও লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতি সুস্পষ্ট। কাব্যগুলিতে বিভিন্ন সময়ে নারীর ' সৌন্দর্য'কে বস্তুতান্ত্রিক ধারণার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এর একমাত্র লক্ষ্য পুরুষের চাহিদাকে সন্তুষ্ট করা।

উপরিউক্ত আলোচনায় মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মাধ্যমে মধ্যযুগের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক অবস্থানকে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচনার শেষে উপরিউক্ত বিষয় ছাড়াও বর্তমান যুগে মনসা ও চণ্ডীর অবস্থানকে আলোচনা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে 'মনসা' ও 'চণ্ডী'র ধারণার বাণিজ্যিকীকরণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পটচিত্র থেকে শুরু করে বর্তমান মণ্ডপসজ্জা, এমনকি টেলিভিশন বা চলচিত্রেও কিভাবে এই দুই অবস্থানকে নির্মাণ করা হয়েছে, তাও বর্তমান গবেষণার আলোচ্য বিষয়।

Shilpa Mondal
গবেষকেরস্বাক্ষর

Mawoona Murmu
তত্ত্বাবধায়কেরস্বাক্ষর

Professor
Department of History
Jadavpur University
Kolkata - 700 032